হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রবাদ-প্রবচন

তপন বাগচী

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র শারদীয় সংখ্যায়। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সংখ্যাটি দুর্গা পূজার আগে সময়মতো অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বের হতে পারেনি। এটি বের হয়েছিল পূজার পরে ডিসেম্বর মাসে। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে (১৩৫৪ সালের আষাঢ় মাসে)। এর এক মাস পরেই লেখকের জীবনের পঞ্চাশ বছর শুরু হয়। তাই এ উপন্যাসকে অনেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনের বাঁকবদলের চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করেন। এ উপন্যাসটি উৎসর্গ করা হয়েছিল কবি কালিদাস রায়-কে। উৎসর্গপত্রে তারাশঙ্কর লিখেছেন :

> [...] রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়। সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না। তুলে দিলাম আপনার হাতে। [...]

শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য না-হওয়ার আশঙ্কা ছিল তারাশঙ্করের মনে। কিন্তু সেই আশঙ্কা ফলবতী হয়নি। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* তারাশঙ্করের 'আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি' হিসেবেও নন্দিত হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশের মাসখানেক পরে তারাশঙ্করের বাড়িতে তাঁর পঞ্চাশ বছর পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত ঘরোয়া উৎসবে খ্যাতিমান সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন :

> তাঁর (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের) দৃষ্টির সামনে আর সেই আলোর দীপালীতে ঝলমল করে উঠেছে তাঁর আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হাঁসুলী বাঁক'। এই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর শুধু 'বাঁশবাঁদি'র কাহারদেরই ফুটিয়ে তোলেননি—ব্রাত্য, মন্ত্রহীন ভারতবর্ষে যুগান্তরের দোলা যেন রূপকচ্ছলে এতে আত্মপ্রকাশ করেছে। [...] চলমান যুগের তিনি সার্থক কাহিনীকার এবং গণসাহিত্যের নির্ভীক অগ্রদূত। (*তারাশঙ্কর রচনাবলী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭)

জন্মদিনের অনুষ্ঠানে কবিশেখর কালিদাস রায় যে কবিতাটি পাঠ করেন তাতেও এই উপন্যাসের পটভূমি ও বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। উপন্যাসের পটভূমিতে আছে রাঢ়ের মাটি আর বিষয়ে রয়েছে রাঢ়ের মাটির রস। উৎসর্গ-প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় কবি লিখেছেন :

> একদা সরস ছিল যে রাঢ়ের মাটি
> সারা দেশ তায় পেয়েছিল রস খাঁটি।
> শুকায়ে উষর সে মাটি হইল ক্রমে,
> একে জীবন্ত কঙ্কাল তায় ভ্রমে।
> সে মাটিতে পুন নবরস সন্ধান
> পাইয়াছ তুমি হে গুণী ভাগ্যবান।

> সেই রসধারা বিলালে গৌড়জনে
> তোমার বাণীতে ফিরে পাই হারাধনে।
> ও মাটির খাঁটি মালিক যাদের জানি
> শুনি ও কণ্ঠে তাদের প্রাণের বাণী। [...]
>
> (*তারাশঙ্কর রচনাবলী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭)

কবি কালিদাস রায় ও সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন থেকে আমরা এ উপন্যাসের গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। লেখক নিজেও এই উপন্যাসটির প্রতি নিরন্তর বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। পূজা সংখ্যার রচনাটিই হুবহু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে পুনর্লিখন কিংবা সংশোধ করা হয়নি। একবছর ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে উপন্যাসের আয়তন প্রায় দশ ফর্মা বৃদ্ধি পায়। লেখক শুধু পরিমার্জনই নয় ব্যাপক সংযোজনও করেছেন এখানে। এর বছর তিনেক পরে বের হয় এর তৃতীয় সংস্করণ। তাতেও লেখকের সংস্কার-বাসনা পূরণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়। লেখকের জীবদ্দশায় এ গ্রন্থের নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নবম সংস্করণেও লেখক ভাষার কিছুটা পরিবর্তন করেছেন। বিশেষত কাহারদের মুখে জুড়ে দেয়া গানের বাণীতে নতুন শব্দ যোগ হয়েছে। গ্রন্থটি যে কালজয়ী হয়েছে, তার পেছনের লেখকের এই বিশেষ মনোযোগ ও প্রযত্নের ভূমিকা ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

বাংলা কথাসাহিত্যে লোকজীবনের রূপায়ণে তারাশঙ্করের মতো আর কেউ এত মুন্সিয়ানার পরিচয় দেননি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধানেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত। কবিয়াল এবং ঝুমুর গানের শিল্পীদের জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁর উপন্যাস *কবি* (১৯৪২) কিংবা যাত্রাশিল্পীদের জীবনযাত্রা নিয়ে তাঁর উপন্যাস *মঞ্জরী অপেরা* (১৯৬৪) ও *অভিনেত্রী*-র (১৯৭১) মতো কোনো পেশাজীবী লোকশিল্পীদের নিয়ে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* রচিত হয়নি। কিন্তু অন্ত্যজ কাহার-সম্প্রদায়ের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে পরম মমতায়। আমরা জানি যে, 'কাহার' নামে কোনো জাতি, উপজাতি বা আদিবাসী নেই। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী 'হরিজন'-দের মধ্যে যারা পালকি বহন করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে 'কাহার' বলা হয়। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে যে কাহারদের কথা বলা হয়েছে, তারা তারাশঙ্করের গ্রাম লাভপুরের মাইল দুয়েক দূরে 'বাঁশবাঁদি' গ্রামের বাসিন্দা। লেখকের বর্ণনায় :

> কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক — অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মতো। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী ; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে — তখন মনে হয় রুপোর হাঁসুলী। এই জন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক। (*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, অবসর সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১)

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে হাঁসুলী বাঁকের বাসিন্দা কাহার-সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন। অন্ত্যজ এই শ্রেণীর গল্প বলা মানেই লোকজীবনের গল্প বলা। তাই গোটা উপন্যাসই ভরে উঠেছে লোকসংস্কৃতির কথকতায়। কর্তাঠাকুর, কালরুদ্র (কালারুদ্দুর), মনসা, বাণ গোসাঁই, ভাঁজোসুন্দরী প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর বিবরণ উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। গাজন, চড়ক, ঘেঁটুপূজা, ভাঁজোপর্ব প্রভৃতি লোকউৎসব কাহারদের লোকজীবনের অঙ্গ। লেখক তাই উপন্যাসের আবরণে এ সকল পর্বকে আন্তরিকভাবে অঙ্কন করেছেন।

প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে এই উপন্যাস ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। যেহেতু সুচাঁদবুড়ির উপকথা বলার ভঙ্গিতে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত, সেখানে প্রবাদ-প্রবচন যেন অনিবার্য অনুষঙ্গ। সুচাঁদবুড়ির হাত থেকে গল্পের নাটাই যখন লেখকের হাতে চলে গেছে, তখনও প্রবাদ-প্রবচনের সদম্ভ উপস্থিতি টের পাই। লোকজীবনের কাহিনী বয়ান করতে জটিল চিত্রকল্প অঙ্কনের চেয়ে প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগই যে যথার্থ, লেখক তা জানতেন বলেই উপন্যাসটি বেশি বাস্তবসম্মত, বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু প্রবাদ সরাসরি উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু প্রবাদ কথকের উক্তির মধ্যে কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু প্রবাদের মর্মার্থ ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের বর্ণনায় কিংবা চরিত্রের কথকতায়। আমাদের সাদা চোখে যে ৬০টি প্রবাদ-প্রবচন ধরা পড়েছে, তার উল্লেখ (*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, প্রাগুক্ত সংস্করণ অনুসরণে) করা যায় :

১. নদীর ধারে বাস, ভাবনা বার মাস। পৃ. ২
২. আসন থেকে আঁস্তাকুড়। পৃ. ৩
৩. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। পৃ. ১০
৪. বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত। পৃ. ১৪
৫. কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। পৃ. ১৪
৬. বেগুনে কেনে খাড়া? না বংশাবলীর ধারা। পৃ. ৩৩
৭. অমাবস্যে রবিবার, মৎস্য খাবে তিনবার। পৃ. ৪০
৮. রাজার দোষে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের দোষে গ্রাম নাশ। পৃ. ৪৩
৯. হাড়ির ললাট—ডোমের দুগ্‌গতি। পৃ. ৪৬
১০. যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন। পৃ. ৬৭
১১. মরি মরি মরি রে মরি, শ্যামের পাশে রাইকিশোরী। পৃ. ৭০
১২. যা রয় সয় তা করতে হয়। পৃ. ৭১
১৩. উড়ে এসে জুড়ে বসল। পৃ. ৭২
১৪. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। পৃ. ৭২
১৫. সব পুত থাকতে নাতির মাথায় হাত। পৃ. ৮৪
১৬. মুখ এখে বাক্যি আর ঠাঁই এখে মার। পৃ. ৮৪
১৭. তোর সঙ্গে ভাব নাই তো হাসলে হবে কি। পৃ. ৮৫
১৮. মানুষের দশ দশা, কখনও হাতি, কখনও মশা। পৃ. ৮৫
১৯. কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার। পৃ. ৮৭
২০. ফাগুনের জল আগুন। পৃ. ৮৮
২১. সকালের মেঘ ডাকলে নামে না, কিন্তু অকালের মেঘ নামবেই। পৃ. ৮৮
২২. এল ভাউরি মল বাউরী। পৃ. ৯১
২৩. সব শেয়ালের এক রা। পৃ. ৯৪
২৪. আমি তো ভূশণ্ডি কাক। পৃ. ৯৪
২৫. যে প্যাটে ছেলে ধরে সে প্যাট কি অন্নে ভরে? পৃ. ৯৭
২৬. তোর ধর্ম তোর ঠাঁই। পৃ. ৯৮
২৭. আজার মায়ের সাজার কথা। পৃ. ১০২
২৮. সাপের হাঁচি বেদেতে চেনে। পৃ. ১০৮
২৯. সাধুজনের সঙ্গে সাধু থাকে, চোরের সঙ্গে চোর। পৃ. ১১২
৩০. ধম্মের পাক সাতটা, পাপের পাক সাতান্নটা। পৃ. ১১২
৩১. ছুঁচোর সাকরেদ চামচিকে। পৃ. ১১৩
৩২. নরমকে ধরম দেখায়। পৃ. ১১৪

৩৩. আমের ধন শ্যামে বিক্রয় করছে। পৃ. ১১৪
৩৪. ধরে মারে সয় বড়। পৃ. ১১৫
৩৫. ড্যাক লইলে ভিখ মেলে না। পৃ. ১২৮
৩৬. ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত। পৃ. ১৩১
৩৭. যে মেরেছে পুড়িয়ে, তার ঘর দিলে উড়িয়ে। পৃ. ১৩৯
৩৮. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পৃ. ১৪৪
৩৯. ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয়। পৃ. ১৫৪
৪০. যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ মানেন না আপন বাপ। পৃ. ১৬৬
৪১. অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে। পৃ. ১৭৫
৪২. পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে। পৃ. ১৭৬
৪৩. জাত যায় এঁটো খেলে। পৃ. ১৭৮
৪৪. সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। পৃ. ১৮১
৪৫. হরি বলতে বলতে চোর সাধু হয়। পৃ. ১৮২
৪৬. আপনার গরজে ধান ভানে মরদে। পৃ. ১৮২
৪৭. শালীর কন্যে আর পালতে-দেওয়া গাইয়ের বাছুর — ও দুই-ই সমান। পৃ. ১৮৩
৪৮. আষাঢ়ে কাড়ান পায় কে? শাঙনে কাড়ান ধানকে। ভাদুরে কাড়ান শিষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিসকে? পৃ. ১৯১
৪৯. উদরের দায় বড় দায়। পৃ. ২০৪
৫০. সাপের লেখা বাঘের দেখা। পৃ. ২০৭
৫১. রাত্রে সাপের নাম করতে নাই, বলতে হয় লতা। পৃ. ২০৯
৫২. মুখ থাকতে নাকে ভাত কেউ খায় নাকি? পৃ. ২১৭
৫৩. ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে রবশ্যাষে — অজাতে পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে। পৃ. ২২২
৫৪. কে করলে ব্রহ্মহত্যা, কার প্রাণ যায়? পৃ. ২২৮
৫৫. সব বেচে সবাই খায়, ধম্ম বেচে কেউ খায় না। পৃ. ২৪৪
৫৬. ধম্মপথে থাকলে আদেক এতে ভাত। পৃ. ২৪৪
৫৭. হাকিম ফেরে তবু হুকুম রদ হয় না। পৃ. ২৪৭
৫৮. সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। পৃ. ২৪৯
৫৯. পোষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে। পৃ. ২৫০
৬০. বেঁচে থাকুক চুড়োবাঁশী, রাই হেন কত মিলবে দাসী। পৃ. ২৫৫

একসঙ্গে এতগুলো প্রবাদ-প্রবচন বাংলা উপন্যাসে খুব একটা চোখে পড়ে না। পাঠভেদে এবং আঞ্চলিক রূপান্তর থাকলেও এই প্রবাদ-প্রবচনগুলো এতই পরিচিত যে এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। লোকমানসের সঙ্গে লেখক কতটা একাত্ম, এই আয়োজনই তার প্রমাণ। প্রবাদগুলো কেবল তারাশঙ্করের লোকসংস্কৃতিচেতনার ধারকই নয়, সমাজচেতনারও ধারক। সামগ্রিক বিবেচনায় ডক্টর নিতাই বসুও হয়তো সে কথা বলতে চেয়েছেন :

> [...] এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃত জগতের বর্ণনায় লেখক অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সভ্যতার আলোকবর্জিত, আদিম জীবন-পিপাসায় উদ্ভ্রান্ত এবং প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে অসহায় মানুষগুলোর চরিত্র চিত্রণের তারাশঙ্করের সমাজজিজ্ঞাসাও প্রতিফলিত হয়েছে। (ড. নিতাই বসু, তারাশঙ্করের *শিল্পিমানস*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ১৭০)

লোকসংস্কৃতিবিদ কিংবা নৃতত্ত্ববিদ যেমন করে অনুসন্ধান করেন, তারাশঙ্করের অনুসন্ধান তার চেয়েও গভীর এবং মমতায়। কাহারদের লোকবিশ্বাস, কুসংস্কারসহ যাবতীয় লোকাচারের বিবরণ পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। গবেষক ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,

> হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবনীশক্তি হচ্ছে তাদের লৌকিক বিশ্বাসগুলি, যা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, টিকিয়ে রেখেছে যুগান্তর ধরে নানা বিপত্তির মধ্য দিয়ে। তাদের জীবনের উত্থান-পতন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র্য সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে এই লৌকিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার। (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার-সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২৯৯)

আবার এই সকল সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে আধুনিক নগরসভ্যতার দিকেও কেউ কেউ পা বাড়ায়, এই সত্যও লেখক উপেক্ষা করেননি। লেখক হয়তো করালীর আচরণের মধ্য দিয়ে কাহার সম্প্রদায়ের আগামীর পথের দিশা খুঁজছেন। এই উপন্যাস সম্পর্কে প্রফেসর ডক্টর বিপ্লব চক্রবর্তীর মন্তব্য তাই প্রণিধানযোগ্য :

> [...] লোককথানির্ভর শিল্পশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন। এই উপন্যাসের গঠনে লোকউপাদানের সমাহার ঘটেছে একান্ত শিল্পসম্মতভাবে। জীবনের পঞ্চাশ বছরের প্রারম্ভে এই উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্কর যে শিল্পসাফল্য লাভ করেন তা এককথায় অভূতপূর্ব। পরবর্তীকালে তিনি যেসব লোককথানির্ভর উপন্যাস লিখেছেন সেসব ক্ষেত্রে এই উপন্যাসের শিল্পরীতির অনুবর্তন দেখা যায়। নাগিনীকন্যার কাহিনী, ভুবনপুরের হাট, পঞ্চপুত্তলী প্রভৃতি উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে। তারাশঙ্করের শিল্পীজীবনের এক অভূতপূর্ব সাফল্যের নাম 'হাঁসুলী বাঁক', 'উপকথা' তারই সফলতম শিল্পকথা। (*তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১২৫)

তারাশঙ্করের এই উপন্যাসটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, একই সঙ্গে কালোত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই উপন্যাসের শক্তিশালী উপাদান যে এর লোকসংস্কৃতির কথকতা, সেকথা সহজেই অনুমেয়। লোককাহিনী, লোকগীতি, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস এ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ-সাফল্যও এ উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ☉